অনাবিল সৌন্দর্যের প্রেরণায়

বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বহুপঠিত লেখক ছিলেন না। প্রাতিষ্ঠানিক পত্রিকার লেখক হওয়া সত্ত্বেও পাঠকের দিক থেকে খুব একটা সাড়া তিনি পাননি কোনওদিন। 'গালিগালাজে'র থেকেও যা তাঁকে বেশি পীড়িত করত, ক্ষুব্ধ করত সেই নিস্পৃহ শীতলতাই তিনি আজীবন পেয়েছেন। তাঁর বইয়ের কাটতি ছিল কম। তাঁর বই থেকে সিনেমা হয়েছে মাত্র একটি, পুরস্কারও জুটেছে মাত্র একটি। ফলে আর্থিক স্বচ্ছলতাও তাঁর অনায়ত্ব থেকে গেছে। প্রচলিত অর্থে তাকে সফল লেখক বলা যায় না। কারণ, বাজার ব্যবস্থায় বইয়ের কাটতি, লিখে রোজগার তথা আর্থিক সাফল্যই শিল্প বিচারের একমাত্র মানদণ্ড। আর সেই বিচারে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁর পূর্বসুরী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও জীবনানন্দ দাশের মতই ডাহা ফেল।

নোবেলজয়ী লেখক গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ এরকম ভাবে বলেছেন যে, কোন উপন্যাস বা গল্পের বই কত বিক্রী হল' তা দিয়ে কিছুই বিচার করা যায় না। আসল প্রশ্নটা হ'ল কটা প্রজন্ম সেই বইটা পেরোতে পারল। সেখানেই তার সার্থকতা। (দ্রঃ লেখকের রান্নাঘর : গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ, ভাষাপৃথিবী ১৪, জানুয়ারি - জুন ১৯৯৭)। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার আগেই মার্কেজের উপন্যাস 'একশ বছরের নিঃসঙ্গতা' ছাপার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গরম কচুরির মত দেদার বিক্রী হতে থাকে। সেই ঘটনা প্রসঙ্গেই মার্কেজের এই মন্তব্য। প্রজন্ম ব্যবধান পেরিয়ে যাওয়াই সাহিত্যমূল্য বিচারের সেরা মানদণ্ড হতে পারে। অনেক লেখক তাঁর সময়ে ধূমকেতুর মতো হঠাৎ প্রচুর আলো ছড়িয়ে জ্বলে উঠে হুস করে নিভে যান। অনেকে নিজের এবং পরবর্তী সময়েও জনপ্রিয় থাকেন, এমনকি ক্রমশ তাঁদের জনপ্রিয়তা বাড়তেও থাকে। আবার কিছু আলোকসামান্য লেখক আছেন, থেকে যান, যাঁরা নিজের সময়ে পাঠকের তত মনোযোগ না পেলেও ধীরে ধীরে পরবর্তী প্রজন্মের শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও আবিষ্কারের বিস্ময় আদায় করে নেন। যেমন, গদ্য লেখখ জীবনানন্দ, যেমন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ছোটোগল্পের ভুবনে ওতপ্রোত থাকে প্রকৃতি, মানুষ, প্রখর অনুভব, সংবেদনশীলতা, যৌনতা, জীবনের স্পর্শ, স্বাদ, শব্দ, রঙ ও ঘ্রাণ। গন্ধ তাঁর গল্পের অন্যতম উপাদান— কি গল্প বয়ানে, কি গল্প সৃষ্টি মুহূর্তে। ছোটবেলা থেকেই তাঁর ঘ্রাণেন্দ্রিয় অত্যন্ত প্রখর। সেই প্রখর ঘ্রাণেন্দ্রিয় দিয়ে তিনি মস্তিষ্কে তুলে নিতেন : ভাদ্র মাসে জলে ডোবানো পাটের পচা গন্ধ, অঘ্রাণে পাকা ধানের গন্ধ, বর্ষার দিনে পুঁটি মৌরলা খলসে মাছের আঁশটে গন্ধ, বাসি বকুল ফুলের তীব্র গন্ধ, ঘাসের গন্ধ, ফুলের গন্ধ, পাখি পোকামাকড়ের গায়ের গন্ধ, প্রতিবেশীর দুই মেয়ে বড়বুড়ি ও যমুনার গায়ে কাঁঠালবিচি ভাজার গন্ধ। বাদলা দিনে মাটির খোলায় ভাজা কাঁঠালবিচি। ঠাকুরদার গায়ে পাকা আমের গন্ধের মতন নিবিড় মদির গন্ধের সঙ্গে মেশা হেলিডির বাংলোর টাটকা গোলাপের গন্ধ, পরিণত বয়সে এইসব গন্ধের স্মৃতি তাঁর অনেক গল্পের উৎস। যেমন কাঁঠালবিচি ভাজার গন্ধ থেকে 'বুটকি বুটকি'; দাদুর গায়ের গন্ধ থেকে 'বনের রাজা'। লেখক বলেছেন : ''আমার 'সমুদ্র' গল্প পড়ে পাঠক বন্ধুরা, আমি যতটা তাঁদের মুখে শুনেছি, কলকাতায় বসে তাঁর পুরীর সমুদ্রতটের রৌদ্রতপ্ত বালু, ক্ষুদে কাঁকড়া, নুন মেশানো বাতাস ও মাছভাজার গন্ধ পেয়েছেন।''

গল্পটি প্রসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্র আরও জানাচ্ছেন: ''একবার পুরী যাই। তা প্রথমদিন পুরী গিয়ে রাত্রে একা একা হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়ি। সমুদ্রের ধারে গিয়ে বসলুম। হঠাৎ কি বলব, বুঝলে, ইলেকট্রিক শক্ খাওয়ার মত সারা শরীরে একটা স্পার্ক খেলে গেল। শরীরটা শিউরে উঠল। আমার মনে হ'ল আমার সামনে এক অসীম শূন্যতা ধূ-ধূ করছে। এর শেষ যে কোথায় বুঝিনি।...কলকাতায় ফিরেই 'সমুদ্র' লিখি।'' (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার অনুষ্টুপ, প্রাক্ শারদীয়া, ২০০৯)

সমুদ্র সম্মোহিত মানুষের গল্প 'সমুদ্র'। ঝামাপুকুরের ফ্ল্যাটের বদ্ধ জীবন থেকে সমুদ্রের বিশাল, উদার, ব্যাপ্তির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে কথক চরিত্রটি। সঙ্গে স্ত্রী হেনা। সমুদ্রের পাশে হেনাকে তার তুচ্ছ, এমনকি ঘৃণ্য মনে হয়। সমুদ্রের গর্জন, ঢেউ ঢেউ-এর মাথায় জুঁইফুলের মতো ফেনা; সমুদ্রের রঙ পরিবর্তন — ছাই থেকে সবুজ, সীসা থেকে রূপো, নীল ময়ূরকণ্ঠী, জাফরান— তাকে সম্মোহিত করে। সে রাতে ঘুমোতে পারে না। হোটেল মালিকের 'মামা', বিশবছর ধরে সমুদ্র আচ্ছন্ন মানুষটি তার সম্মোহন আরও বাড়িয়ে দেয়। সে দেখায় সমুদ্র কোন নবাগত কোমল দেবতা নয়, সে প্রবল, ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ পুরুষ, আক্রোশে ফুঁসছে, সাদা ঢেউগুলো কোন হিংস্র প্রাণীর ঝকঝকে দাঁত, জুঁই ফুলের গুচ্ছ নয়। সমুদ্র ফুল পাতা খায় না। সে সর্বভূক্, আমিষাশী— তার শরীরের আমিষ গন্ধ। মামা তাকে খাওয়ায়— কেক, মাছভাত, ডিমের বড়া। হোটেল মালিকের অ্যালসেশিয়ানের বাচ্চা, নিজের স্ত্রী, হ্যাঁ, নিজের স্ত্রীকেও সে সমুদ্রে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। কথকও সেই সম্মোহনে জড়িয়ে হেনাকে ঠেলে দিতে চায় সমুদ্রে। কারণ সমুদ্র তখন 'সাদা কঠিন হিংস্র দাঁতের হাঁ নিয়ে গোঁ গোঁ করে ছুটে আসছে।

গল্পটি উত্তম পুরুষে লেখা। 'আমি' চরিত্রটি সমুদ্রের কাছে এসে সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্তি চাইছিল। মুক্তি চাইচিল ঝামাপুকুরের ফ্ল্যাটের বদ্ধ সংকীর্ণ জীবন থেকে। মুক্তি চাইচিল হেনার সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো দাম্পত্য থেকে। তাই কি সে সমুদ্রের আকর্ষণের সম্মোহনে হেনাকে উৎসর্গ করতে চাইছিল সমুদ্রের কাছে।

'নদী ও নারী' প্রকাশিত হয় 'পরিচয়' পত্রিকায় ১৯৩৮ সালে। পদ্মার বিস্তৃত পটভূমি, অগাধ আকাশ, ছায়ানিবিড় শামল তট, জল আর মাটির সংযোগস্থলে গল্পটি স্থাপিত। সুরপতি আর নির্মলা, স্বামী-স্ত্রী, নৌকোয় পদ্মার বুকে বেড়াতে বেড়াতে যে ছায়াস্নিগ্ধ পাড়টিতে নৌকো বাঁধে সেখানে আগে থেকেই রয়েছে এক সুদৃশ্য সাদা রঙের বোট। সেই বোটে এক রহস্যময়ী। নীল শাড়ি পরে, বেঁটে ছাতা বাঁ হাতে ধরে, সম্রাজ্ঞীর মতো বোটের ছায়া আলো করে বসে বঁড়শি দিয়ে মাছ ধরছেন, 'বব্ড

কাটা' চুলের মেমসাহেবটি। তিনি রাতে সস্তা থিয়েটারি গলায় গান করেন। সুরপতি আর নির্মলা উদগ্র কৌতূহলে তাকে লক্ষ্য করে। মেয়েটির উগ্র ফ্যাশন আর রুচির বিকৃতির কথা বলাবলি করে। তার চালচলন দেখে শিউরে ওঠে, নোংরা ইঙ্গিতের দিকে চলে যায়। রাতে মেয়েটির গানের রেশটা কুৎসিত সরীসৃপের মতো নির্মলার কাছে কিলবিল করে।

মেয়েটির সঙ্গে আলাপ হল চরে বেড়াতে গিয়ে। হলদে শাড়িতে চিতাবাঘের মতো মেয়েটি বন্দুক হাতে পাখি মারার চেষ্টা করছিল। নিজেই এসে আলাপ করল। বোটে নিমন্ত্রণ জানাল। তার 'মধ্যাহ্নের আকাশের মত স্বচ্ছ প্রখর চাউনি। শিস দিতে দিতে বালির উপর দিয়ে তরতর করে সে চরের দিকটায় নেমে গেল।' তারপর ছোট একটা ডিঙি চড়ে নিজের হাতে বৈঠা বেয়ে চলে গেল মাঝনদীতে— যে মাঝনদী পেরোতে নির্মলার মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল, দু'জন পুরুষ সঙ্গী থাকা সত্ত্বেও।

তারপর একদিন বিদ্বেষ, বিতৃষ্ণা সত্ত্বেও কৌতূহলের চাপে সুরপতিরা বোটে পৌঁছয়। বোটের ভেতরের সংসার পরিচ্ছন্ন করে সাজানো। একটি খাট। খাটে শুয়ে এক পঙ্গু মানুষ যাঁর হাত ও একটি পা নেই। ছিলেন চীফ এঞ্জিনিয়ার, নীলিমার স্বামী। নীলিমা সেই উগ্র আধুনিকা, তথাকথিত মেমসাহেব মেয়েটি। ওর স্বামী বিয়ের একবছর পরে একটি দুর্ঘটনায় পঙ্গু, অসহায়। বুকেও দোষ। তাই ডাক্তারের নির্দেশে জলে জলে ঘোরে। সর্বোপরি চোখের নার্ভ নষ্ট হয়ে ভদ্রলোক অন্ধ। এই স্বামীর সঙ্গে বাঁধা নীলিমার জীবন। তবু কোথাও দুঃখবিলাস নেই। প্রাণশক্তিতে উচ্ছল নীলিমা মৃত্যুর দ্বারে বসে জীবনের গান গাইছে, তাই সেই গান; যে গান দু'দিন আগেও কুৎসিত লেগেছিল সুরপতিদের আজ মনে হয় অপূর্ব।

'রাইচরণের বাবরি' দেশ পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, ১৯৩৬ সালে। রাইচরণ ঘোষ পেশায় দরজি। তার চুলের বাবরি একটি দেখার মতন জিনিষ। 'একটা চুলের গায়ে আর একটা লাগিয়া নাই— কোঁকড়া, লম্বা, চিকণ, সাপের মত ঢেউ খেলানো।' বাবরি নিয়ে রাইচরণের গর্ব আছে। পাড়ার লোকে তাকে বাবরি ব'লে ডাকলে তার রাগ হয় না, বরং সে খুশিই হয়। বাবরির কল্যাণে তার বৌবাজারের দর্জির দোকানে খদ্দের বাড়ে। বাবরি দেখতে এসে অনেকেই পাঞ্জাবি, শার্ট যা হোক একটা কিছু অর্ডার দিয়ে যায়। কিন্তু তার বউ মানদা দু'চাখে দেখতে পারে না এই বাবরি। প্রায়ই বঁটি দিয়ে কাটতে যায়। যাই হোক, একদিন এক থিয়েটারের ম্যানেজার এসে রাইচরণকে থিয়েটারে অভিনয় করার প্রস্তাব দিলেন। মাসমাইনে একশ' টাকা। তার বাবরির কদর বাইরে কতটা এটা মানদাকে জাঁক করে বোঝাতে গিয়েই বিপত্তি। শেষে মানদার চাপেই থিয়েটারের কাজে নামা। মহড়া চলতে চলতে রাইচরণ বুঝতে পারল যে থিয়েটারে সবকিছুই কৃত্রিম— সাজসজ্জা, পোষাক আশাক, অস্ত্র-শস্ত্র, ঘরবাড়ি সব। এমনকি অভিনীত চরিত্রগুলো পর্যন্ত কাল্পনিক, মিথ্যা। আর এতেই অভ্যস্ত দর্শক। তাহলে রাইচরণের মনে হয়, দর্শকরা নিশ্চয়ই তার বাবরিটাকেও আসল নয়, নকল মনে করবে। মনে হবে পরচুলা। বাবরির এই অবমাননা তার কাছে অসহ্য। তাই থিয়েটারের মিথ্যা জগৎ থেকে সে তার বাবরির সত্য জগতে ফিরে যায়, তার সেলাই-এর দোকানে। সেখানে পয়সা রোজগারও হবে বাবরিও দেখানো চলবে। কিন্তু পয়সার বিনিময়ে তার অস্তিত্বের সমার্থক বাবরির অপমান কিছুতেই হতে দেবে না রাইচরণ।

'বনের রাজা' গল্পের উৎস দু'টো গন্ধ। 'দীর্ঘায়ু লোভী ঠাকুর্দার গায়ের পাকা আমের গন্ধের মতন নিবিড় মদির গন্ধ ও হেলিডির বাংলোর গোলাপের টাটকা গন্ধ। ঠাকুর্দার সঙ্গে ভোরে বেড়াতে যেতেন বালক জ্যোতিরিন্দ্র। গল্পের দাদু ও নাতিও বেড়াচ্ছে, দাদুর বাগানে। দাদু সারদা রায় ছিলেন এঞ্জিনিয়ার। কলকাতার বাড়ি গাড়ি বিক্রী করে গ্রামে বাগান পুকুরসহ বাড়ি করেছেন। বাগানে প্রচুর ফলের গাছ— আম, জাম, কাঁঠাল, জামরুল, কলা, আনারস; পেয়ারা, কামরাঙা, সবেদা, অজস্র পাখপাখালি, কাঠবেড়ালি, বাদুড়। এই নিবিড় বাগানে ঘুরে বেড়ায় দাদু নাতি। দাদু নাতিকে জানান এক আশ্চর্য তথ্য যে গাছেরা তাঁর সঙ্গে কথা বলে। নাতি কিন্তু গাছের গুঁড়িতে কান চেপেও কোন কথা শুনতে পায় না। দাদু বলেন : 'কান নষ্ট হয়ে গেছে তোর— শহরে থেকে থেকে এটি হয়েছে দাদু।' কিন্তু বীড্‌ন স্ট্রীটেও তো গাছ আছে। সে গাছেরা বোবা। গাড়ির আওয়াজ, রেডিওর চিৎকার, পাথরের খোয়া, গরম পীচ, ইলেকট্রিক তার, বড়ো বড়ো দালানের চাপে তার মূক, বধির— প্রাণটা ধুকপুক করে কোনক্রমে। তাদের ডালে রঙবেরঙের পাখিরা আসে না, গান গায় না, পাতার বোঁটায় ঠোঁট ঘষে না, ফলে ঠোকর মারে না। সারদার বাগানের মত জ্যান্ত, সতেজ, পাখির কলতানে উচ্ছল গাছ কলকাতা শহরে কোথায়?

দাদু নাতি ঘুরে বেড়ায়। শক্তপোক্ত ষাট বছরের দাদু অনায়াসে জামগাছে উঠে জামপাড়ে, টসটসে রসালো জাম পাড়ে আর খায়। নাতিকেও দেয়। নাতি অত খেতে পারে না। দাদুর মতো শহরে থেকে বাসি পচা খেয়ে খেয়ে 'পেট চিমসি মেরে গেছে।' জামের পরে জামরুল, দুধসাদা রসালো জামরুল। দাদু কচকচিয়ে খায়। সজীব প্রাণের মধ্যে থেকে সজীবতা গায়ে মুখে মেখে, পেটে ভরে নিয়ে দাদু আয়ুর ফিতে লম্বা করে। শহর থেকে এসে টাটকা সতেজ খাবার খেয়ে দাদুর খাওয়াও বেড়ে গেছে। এমনভাবে মাছ খায় যেন গা দিয়ে মাছের গন্ধ বেরোয়, এমনভাবে আম খায় যেন গা দিয়ে আমের গন্ধ বেরোয়। দাদুর গায়ে তাই মিশ্র এক গন্ধ। সতেজ গন্ধ এক— তাজা জীবনের উৎফুল্ল গন্ধ। দাদু মাঝে মাঝে নিরাভরণ হয়ে উদার প্রকৃতির সাথে মিশে যায়। ঘাসের ওপর হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে থাকে। জলে নেবে যায়।

একটি মেয়ে আসে। ছোট মেয়ে। পাতা কুড়ুনি। সে জলে নামে জল খেতে। জলের ভেতর দাদু। নগ্ন দাদু। শহুরে নাতি চমকে ওঠে। 'ভয় বিস্ময় ঘৃণা আশঙ্কা বিতৃষ্ণা বিষণ্ণতার ছোট বড়ো নানারকম তরঙ্গ ওঠে তার ছোট্ট বুকে। দাদু নগ্ন দাদু, কোমরজলে দাঁড়িয়ে মেয়েটির সথে গল্প করে, হাসে, নাতির কাছে প্রিয়তম দাদু তখন, 'একটা জন্তু, একটা দানো, একটা ভয়ঙ্কর কুৎসিত জীবে পরিণত। দাদু সাঁতার কেটে শাপ্‌লার ফুল তুলে আনে। মেয়েটি খোঁপায় গোঁজে। হাসে। জল খায়। চলে যায়

সারদা উঠে আসেন জল থেকে। 'টপটপ জল ঝরছে কান থেকে, নাকের ডগা থেকে, থুতনি থেকে, হাতের আঙুলগুলি

থেকে। দাদুর উলঙ্গ শরীর দেখে মনে হয় পুরোন গাছ। দাদুর শরীর থেকে গন্ধ আসে 'কোমল মিষ্টি ঠান্ডা মৃদু শাপলা ফুলের গন্ধ।' সজল নিবিড় প্রকৃতির মধ্যে একাত্ম বনের রাজা সারদা রায় প্রকৃত রাজার মত তাঁর রাজত্ব উৎসর্গ করেছেন প্রকৃতিরই কাছে। বাদুড়, কাঠবেড়ালি, পাখাপাখালি এবং পাতা কুড়নি ছোটো মেয়েটাও প্রকৃতিরই অঙ্গ। এই সার সত্যটা আয়ুর ফিতে বাড়াতে দরকার কি না শহুরে সংসারি নাতি ঠিক বুঝতে পারে না।

'গিরগিটি' গল্পে মায়া যখন নগ্ন হয়ে কুয়োতলায় স্নান করে তখন তাকে দেখে নিমগাছ, মাদার গাছ, ডুমুর আর পেঁপের ঝাড়, চড়ুই, বুলবুলি, জমানো ইঁটের শ্যাওলাধরা পাঁজা, নোনাধরা ভাঙা পাঁচিল। না, মানুষ কেউ নয়। মায়ার স্বামী কাজে যায়। আর ওদিকের ঘরে থাকে বুড়ো ভুবন সরকার — কুয়োতলায় সে খুব একটা আসে না। মায়া নিজেই নিজেকে দেখে। কুয়োর জলে দেখে। ঘরের আরশিতে দেখে। তাই বাইশ বছরের যৌবনের অপার উচ্ছ্বসিত সৌন্দর্য নিজেই তারিয়ে উপভোগ করে। প্রণব তার জীবনে একমাত্র পুরুষ। তার মুখে নিজের 'রূপ যৌবন শরীরের অঢেল লাবণ্যের প্রশংসা শুনে শুনে মায়া ক্লান্ত, বিরক্ত। মায়া ভাবে, ''মরা মাদার গাছ কি নোনাধরা পাঁচিলটা যদি হঠাৎ মুখ ফুটে বলে ওঠে, 'চমৎকার! কত সুন্দর তুমি।'' মায়া চায় তার সৌন্দর্যের মুগ্ধতা অপরের চোখে, অন্যের অনুভূতিতে। নিছক সৌন্দর্যের। প্রণব সৌন্দর্য দেখতে পায় না। না প্রকৃতিতে, না মায়ার শরীরে। সে অন্ধ। সে চায় সম্ভোগ। সম্ভোগের বিনিময়ে দেয় উপহার— পাউডার কৌটো, ফজলি আম। মায়ার কাছে প্রণব তাই ক্রমশঃ বিরক্তির, অসহ্য হয়ে ওঠে। বিশেষতঃ ভুবনের চোখে নিজেকে দেখার পর।

বুড়ো ইলেকট্রিক মিস্ত্রী ভুবন। মরা মাদার গাছের মতো বিবর্ণ, ঘোলাটে চোখের ভুবন, যার কথায় শুধু ডুমুর পাতার খসখস আওয়াজ। সুন্দরের সামনে এলে তার ঘোলাটে চোখে এক আশ্চর্য মায়াবী আয়না জেগে ওঠে কে জানত!

মায়া যখন স্নান করে তখন ভুবন কুয়োতলায় আসে না। কোনও প্রয়োজনে একদিন এল। খোলা প্রকৃতির মাঝখানে অসংকোচ নগ্ন স্নানে অভ্যস্ত মায়া সংযত হয়। কিন্তু ভুবনকে দেখে ওর ভাঙা পাঁচিল বা মরা মাদার গাছের কথা মনে হয়। ধীরে ধীরে সংকোচ সরে চায়। তারপর ভুবনের মুখে, 'দিদিকে দেখলে আমার কেবলই ওই ডালিম চারাটার কথা মনে পড়ে' শুনে, যেন খুব বেশি চমকে উঠল মায়া'। ডালিম গাছটা দেখল। সতেজ, যৌবনবর্তী গাছ। যেন হাস্যমুখরিত একটি মেয়ে। পাতার আড়ালে 'সুগোল, সুঠাম আশ্চর্য দুটি ফল, আয়নায় শরীর নিরাভরণ করে দেখতে দেখতে মায়ার নিজেকেই সেই ডালিম গাছ মনে হল। 'পুলকের বিদ্যুৎ শিহরণ তার মেরুদাঁড়ায় খেলা করে গেল... ।' 'আকাশ ভেঙে জোরে বৃষ্টি নামল। আর আয়নার সামনে নাচের ভঙ্গিতে ঘুরে ঘুরে কোটিবার ও নিজেকে দেখল।'

শুরু হল নতুন খেলা। এতকাল পোকা, ঘাস, আকাশ, বাতাস, গাছ, গাছের পাতা, শালিক, বুলবুলিদের তার যৌবন দেখাত মায়া। প্রণবকে বলে, 'কোনো মানুষ না, পুরুষকে দেখাই না। তোমাকে দেখে দেখে পুরুষ জাতটার ওপর ঘেন্না ধরে গেছে, অন্তত আমার। প্রণবের মতো পুরুষের কাছে নিছক সৌন্দর্যের কোন দাম নেই। তারা সুন্দরকে জেনে ঘেঁটে চটকে পিণ্ড বানিয়ে ভোগ করতে চায়। ভুবন কি পুরুষ? না একটা গাছ! মরা গাছ। অথবা নোনাধরা পাঁচিল। ভুবন কিন্তু মায়ার শরীরের সতেজ, অনাবিল সৌন্দর্যের মূল্য দেয়। ডালিম গাছের উপমা দিয়ে তার যৌবনকে অর্থময় করে তোলে। তাই যখন তখন ভুবনের কাছে যাওয়া ঘটে মায়ার— মাঝদুপুরে অথবা মাঝরাতে। গরমের অছিলায় বুকের আঁচল সরিয়ে অথবা জংলা ছাপা শায়া পরে শুধু। ভুবনের চোখে কখনও তার ছুটে যাওয়াটা 'রাজহংসীর গতিভঙ্গী' কিংবা তার চোখদুটো, তার দৃষ্টি, 'বাঘিনী বনের মধ্যে শিকার খুঁজছে, যে রকম দৃষ্টি সেই চোখ।' চাঁদের আলোয় চিকরিকাটা আল্পনার রাতের ভুবন বৌবাজার থেকে সাদা দোপাটির মালা নিয়ে আসে, মায়ার চুলে পরায়। বলে, 'রাতে খুলবে ভাল। রাতে চুলে সাদা মানায়।'

বিবর্ণ শুকিয়ে যাওয়া গাছের বাকলের মতো যার চামড়া সেই ভুবন তিনবার বিয়ে করেছে। চতুর্থ আর একটি প্রস্তাব এসেছে। দ্বিধা আছে তবে ভুবন বারণ করে দেবে। কেন দ্বিধা? ''আবেগে ভুবন হিসহিস করে উঠল, 'কিন্তু পিপাসা যে মেটে না, পিপাসার যে নিরবিত্তি নেই।' কিসের পিপাসা? রূপের? যৌনতার? সম্ভোগের? কিন্তু ভুবন হিসহিস করে কেন? কেন সরীসৃপের অনুষঙ্গ: সেই হিসহিসানি শুনে মায়া কেন 'পাথরে স্থির, শক্ত হয়ে যায়। যখন জংলা ছাপা শায়াটা পরে মায়া এসে দাঁড়িয়েছিল ভুবনের সামনে, জানতে চেয়েছিল কেমন মানিয়েছে। জবাবে ভুবন যে বলেছিল, 'বনের চিতার মতন সরু ছিমছাম মাজাঘষা কোমর দিদির তখন তো মায়া ভয় পায়নি! কান্নাও পায়নি তার। তবে ভুবন যখন বলে, 'ভেতরে রসের বাল্ব জ্বেলে রেখে দৃষ্টিটাকে আয়নার মত ঝকঝকে করে রেখেছি, ছানি পড়তে দিইনি, দিদির কি এখনো বুঝতে বাকি।' তখন কেন মায়া ভয় পেয়ে আঁৎকে উঠল? কেন তার কান্না পেল? সে কি এজন্য নয়, যে, মায়া যাকে পেঁপে গাছ, ডুমুর গাছ, মাদার গাছ, ভাঙা পাঁচিল আর শ্যাওলা ধরা ইঁটের পাঁজার সমগ্রতার ভেতরে গ্রহণ করেছিল, যার আলাদা কোন অস্তিত্বের বোধ মায়ার ছিল না। গাছ, পাখি, ফড়িংদের কাছে যেমন সে নিজেকে অসংকোচে খুলে দেয়, তেমনি ভুবনকেও। তফাৎ শুধু একটাই ভুবনের চোখে তার রূপের, যৌবনের প্রতিফলন। যে শরীর সে স্বামীকে দেখাতেও লজ্জা পায়, তার ভাল লাগে না কারণ সে জানে প্রণবের মুগ্ধ দৃষ্টির আড়ালে লুকিয়ে থাকে শুধু সম্ভোগ। তার যৌবনের সৌন্দর্যের উপচারে নয়, যৌনতার, কামনার উপচারে সে মুগ্ধ। সেইজন্য আপত্তি নিয়ে ব্লাউজের বোতামে হাত দেয় মায়া এবং আলো নিভিয়ে দেয়। কিন্তু ভুবনের ক্ষেত্রে সে সংকোচ থাকে না। কারণ যেমন লাল ফড়িংগুলোকে অসংকোচে তার জঙ্ঘা, স্তন ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখতে দেয়। তেমনই অসংকোচে ভুবনকে দেখতে দেয়ে তার বুক, কোমর, পিঠ, পা। মাঝে মাঝে দৃষ্টিতে সতর্কতা এনেও পরক্ষণেই তা কোমল হয়ে যায়? সেই ভুবনের অমন গাঢ় আবেগের হিসহিসানিতে সে কি এটাই বুঝল যে পোকায় খাওয়া গাছের বাকলের মতো শুকনো চামড়া, কাঠির মত সরু হাত পা, হলদে ফ্যাকাশে দৃষ্টি সবই কামোফ্লাজ? সমস্ত সৌন্দর্যবোধ, রূপতৃষ্ণার আড়ালে সেই সাবেকি যৌনতা? যেমন গিরগিটি গাছের ডালের সঙ্গে মিশে লালফড়িং দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকে, ফড়িং -এর যৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে নয়, তাকে

শিকার করার আশায়—ভুবন কি চোখের মধ্যে রসের বাল্ব জ্বেলে রেখেছে সেই আশাতেই?

তবে খাদ ছাড়া খাঁটি সোনায় তেমন অলঙ্কার হয় না তেমনই যৌনতার, কামনার ভেজাল ছাড়া নারীরূপ পুরুষের চোখে প্রতিফলিত হয় না। ভুবনের রূপপিপাসা তাকে বাঁচিয়ে রাখে, মায়াকেও বাঁচিয়ে রাখে কারণ ভুবনের সৌন্দর্য তৃষ্ণার ভেতরেই সে নিজের তুচ্ছ সংসারিকতা থেকে মুক্তি খোঁজে। তাই ভুবনকে নতুন করে আবিষ্কারের ভয় ও তদ্‌জাত কান্না সে 'সহজেই জয় করতে পারে।

মা মারা যাওয়ার পর সোদপুর থেকে বালিগঞ্জের মাসির বাড়ি থাকতে এল গণেশ, 'শ্বাপদ' গল্পে তার মাসতুতো ভাই শহুরে, স্মার্ট খোকনের চোখে যে একটা গেঁয়ো জংলী ভূত। প্রথমে তাকে প্রত্যাখ্যান করলেও পরে এক হিংস্র উল্লাসে, যেমন খেলা দেখাবার জন্য সার্কাসের দলের লোকেরা বনের পশুকে শিখিয়ে পড়িয়ে তোলে' —তেমনই তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে সভ্য করার দায়িত্ব নেয় খোকন। কারণ, 'সার্কাসের শিম্পাঞ্জি দাড়ি কামায় সিগারেট টানে খবরের কাগজ পড়ে আমার দেখা আছে। যেন সোদপুরের গণেশ সম্পর্কেও আমার সেই ধরনের উৎসাহ'। সেই উৎসাহে তাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে বাবু সাজতে শেখায়। সিগারেট ফুঁকতে, দাড়ি কামাতে শেখায়। শেখায় সিনেমার কাগজের সুন্দরী অভিনেত্রীদের 'ওপর উপুড় হয়ে থাকতে'।

''একটা খেলা আমার— একটা আনন্দ। যেন আমার মনের ভাবটা এই, পোষা জন্তুটা আমার সবকিছু অনুকরণ করুক, শিখুক, তারপর কি দাঁড়ায়, কতটা যায় দেখা যাবে।''

দেখা গেল, খোকন বোঝেনি তার ট্রেনিং-এ গণেশের ভেতর লুকিয়ে থাকা শ্বাপদ জেগে উঠছে। তাকে নিয়ন্ত্রণ করার সাধ্য খোকনের নেই। এক ছুটির বিকেলে গণেশকে নিয়ে প্রেমিকা রুবির কাছে গেল খোকন। খোকনের হুকুমে গণেশ দীঘি থেকে পদ্ম তুলে রুবির খোঁপায় পরায়। গণেশের সুঠাম শরীর রুবিকে টানে। খোকন বোঝে না। সে ভাবে গণেশ একটা জন্তু, যে শুধু তার হুকুম তামিল করে। খোকন নিশ্চিন্তে সিগারেট খায়। গণেশ গাছে ওঠে পেয়ারা পেড়ে দেয়। খোকনকে রেখে ওরা কামরাঙা পাড়ার ছলে হারিয়ে যায়। খুঁজে পাওয়া যায় না। খোকনের মনে হয় গণেশ একটা গাছ হয়ে অরণ্যে মিশে গেছে এবং রুবিকে জীর্ণ করে ফেলেছে।

একগুষ্টি ছেলেমেয়ে, ইনভ্যালিড বউ নিয়ে অন্ধকার একটি পুরোনো বাড়িতে কুলদার দমচাপা জীবন কাটে। সেই বাড়িরই অপর অংশে অন্য কোথাও বাসা না পেয়ে ছুটি কাটাতে আসে স্বচ্ছল, প্রবাসী এক দম্পতি। তাদের ঘরে উজ্জ্বল আলো, পরিচ্ছন্ন ফিটফাট ছিমছাম সংসার। হ্যাজাকের ডোমটা সাদা না হয়ে লাল হওয়াতে ঘরটা আরও সুন্দর রহস্যময়। 'লাল, মঙ্গলগ্রহের মতো লাল স্তব্ধ' সেই ঘরের দিকে চেয়ে পলক পড়ে না কুলদার।

গল্পের নাম 'মঙ্গলগ্রহ'। মহিলার নাম লীলাময়ী। জীবনে প্রথম পরিপূর্ণ যৌবন দেখা কুলদা সহজেই লীলাময়ীর আকর্ষণে বাঁধা পড়ে। লীলাময়ীর টিঙটিঙে রোগা এঞ্জিনিয়ার স্বামীটি বাইরে বাইরে ঘুরে রাত বারোটার আগে ফেরেন না। এদিকে বাসা পাওয়ার মত চাকরবাকর পাওয়াও কলকাতা শহরে খুব কঠিন, লীলাময়ী জানায়। লীলাময়ী কুলদার মুগ্ধতা পড়ে নিতে পারে। হা ঘরে হভাতে কুলদার সামনে নিজের যৌবনকে ঝুলিয়ে দেয়, যেমন কুকুরের সামনে মাংসখণ্ড। আধবুড়ো কুলদাকে চাকরের মত খাটায় লীলাময়ী। কুলদা পাঁচ দোকান খুঁজে সেরা মাংস, সেরা ইলিশ আনে। স্বামী স্ত্রী দু'জনেই অবশ্য প্রচুর ভদ্রতার আবরণ বজায় রাখে। 'খুব করছেন আমাদের জন্য', 'দয়া করে একটা রিক্‌শা ডেকে দিন না', 'আজ আবার আপনাকে একটু কষ্ট দেবো।' 'দু' বার ভেবেছি আপনাকে বলবো কি না, আমার তো আর লোকজন নেই, 'আর 'নিবিড় পরিচ্ছন্ন যৌবনের সামনে দাঁড়িয়ে কুলদার বুকের ভেতর কাঁপে, চোখের পলক পড়ে না' কুলদা ভাবে 'এমন পরিষ্কার স্বচ্ছ চোখে কোন নারী আমার দিকে তাকায় নি, এমন সুন্দর সহজ গলায় কথা বলেনি।' কুলদা দেখে, 'দীর্ঘশ্বাস ফেলে যুবতী ঘাড় ঘোরালো, শরীর ঘোরালো। অপরূপ দীর্ঘ দেহ, ঘন চকচকে ছোপ দেওয়া শাড়ি পরনে। মনে হল মঙ্গলগ্রহের লাল অরণ্যে নিঃশব্দচারিণী কোনো বাঘিনী।' 'হাসলো ও, যেন তারের যন্ত্রে ছড় টেনে গেলো।'

লীলাময়ী কুলদাকে নিয়ে খেলা করে। কুলদা যেন তার 'হাতের পুত্তলি'। লীলাময়ীর পরিচ্ছন্ন যৌবন, সৌন্দর্য, সংসারের ছিমছাম ভাব কুলদার কাছে মুক্তির সমান, হাঁফ ছাড়ার জায়গা, প্রলেপের জায়গায়, নিজের পরিবারে অসহ্য দমচাপা পরিবেশ থেকে মুক্তি, নিঃশ্বাস ফেলা, ক্ষতে প্রলেপ। কিন্তু মুক্তি খুঁজতে গিয়ে কুলদার সম্মান মাটিতে মিশে যায়। কুলদার অস্তিত্ব লীলাময়ীর তালুবন্দী। হুকুম হয় মাছ কেটে দেবার, সিগারেট নিয়ে আসার। কুলদা বোঝে গালে লেগে থাকা ইলিশের রক্ত মুছে দিতে দিতে লীলাময়ী ওকে বিনি মায়নার চাকরে পরিণত করেছে।

'খালপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর' নামক অনবদ্য গল্পটিতে চিত্রকর উমেশ খান সদ্যনির্মিত কংক্রীটের পোলটিকে ক্যানভাস হিসেবে ব্যবহার করে ছবির বাজার যাচাই করার জন্য। খালপোলটি শহর আর গ্রাম, উন্নয়ণ আর অনুন্নয়ণ, শিল্প আর কৃষি, গরীব আর বড়লোকদের যোগাযোগের সেতু। খালপোলে এপারের সাথে ওপারের মুখ দেখাদেখি। ফলে উমেশ সব ধরনের দর্শকই পেয়ে যায়। তাদের মন্তব্যে, কাণ্ডকারখানায় যা যার রুচি পছন্দ প্রতিফলিত হয়। অজ্ঞাত শিল্পী কারও কাছে পাগল, কারও কাছে প্রফেট। কিন্তু উলঙ্গ নরনারীর ছবি সবারই শিষ্টাচার, রুচি ও বোধে আঘাত করে, সব মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে এক বৃদ্ধ ও এক যুবক যে ছবি মুছে দেয়।

তারপর উত্তেজনা থিতিয়ে গেলে খালপোল যখন নিঃশব্দ, একা, তখন উমেশ তার ছবির পসরা নিয়ে বেরোয়, বউকে বলে ''মনে হয় একটি ভাল বাজার পেয়েছি।' তার কাছে কালী, দুর্গা, 'পরমহংস -টংস,' 'দু' একটা ল্যান্ডস্কেপ মেয়েটেয়ের' ছবিও আছে। তবে মেয়েটেয়ে গুলো সবার শেষে। আগে কালী, দুর্গা, পরমহংস তারপর ও সব। উমেশ জানে কোন্ পাবলিক কি চায়। খালের পোলে তার সফল পরীক্ষা।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন জ্যোতিরিন্দ্র কি ভাবে গল্প বলতেন। ''দু বন্ধু একবার পুরী বেড়াতে যায়... একটি বাড়ি ভাড়া করে সেখানে থাকার বন্দোবস্ত করে... তারপর, বুঝলেন ছেলেটা মেয়েটাকে খুন করে ফল্ল... হ্যাঁ হ্যাঁ খুন... তা, তখন, কী হল... বুঝলেন ...পাশের ঝাউবনে সাঁই... সাঁই ... সাঁই করে হাওয়া শুরু হয়ে গেল। অর্থাৎ মজাটা হল — মেয়েটা খুন হয়ে গেল — এ ব্যাপারটাকে উনি একদম পাত্তাই দিলেন না, পাশের ঝাউবনের সাঁই সাঁই করে ঝড়ের বর্ণনায় তাঁর চোখ মুখ সব একেবারে বদলে গেল...।'' (অনুষ্টুপ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বিশেষ সংখ্যা, ২০০৯ পৃ: ২৫১)

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে বয়ানের কৌশল বুঝতে এই বর্ণনাটা জরুরী। আমপাঠক গল্পের যে অংশ শুনতে চায়, যে নিটোল পরিণতি তাদের কাঙ্ক্ষিত, যে কৌতূহল তাকে কুরে কুরে খায় সে সব দিকে লক্ষ্যই না করে নিজের অর্ন্তনিহিত সৌন্দর্য প্রেরণায় তিনি সৃষ্টি করতেন অন্য এক ভুবন, ভেঙে দিতেন পাঠক মনোরঞ্জনের তথাকথিত স্বাভাবিক পরিমতির সমস্ত সম্ভাবনা।

কোনো ভাবাদর্শের প্রেরণায়, কোন সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে 'আলো দেখাবার জন্য, উত্তরণ দেখাবার জন্য' কোনওদিন গল্প লেখেননি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। তাঁর প্রেরণা ছিল একমাত্র তাঁর নিজস্ব সৌন্দর্যদর্শন, নিজস্ব সৌন্দর্যসন্ধান। বাংলা গল্পে বিশুদ্ধ সৌন্দর্য সন্ধানের প্রেরণায় গল্প লেখার ক্ষেত্রে তিনি বোধহয় নিঃসঙ্গ। গল্পে যৌনতা, অবক্ষয় থাকলেও সবকিছু ঝাপিয়ে উঠেছে তীব্র সৌন্দর্য পিপাসা। তাই প্রকৃতি ও নারী তাঁর গল্পে এত বিচিত্র রূপে এসেছে বারবার। নারী ও প্রকৃতি বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের আধার। চিরন্তন সৌন্দর্য। তবে প্রকৃতিতে যে সৌন্দর্য তিনি দেখেছেন তা খুব কোমল, স্নিগ্ধ, শান্ত সৌন্দর্য নয়। এখানেই বিভূতিভূষণের প্রকৃতি থেকে তিনি স্বতন্ত্র। তাঁর প্রকৃতি খানিকটা ক্ষুব্ধ, রুক্ষ। যেমন 'সমুদ্র' গল্পের সমুদ্র। প্রবল, বিক্ষুব্ধ, হিংস্র। ফেনাকে মনে হচ্ছে ঝকমকে দাঁত, নরম জুঁইফুলের গুচ্ছ নয়। 'গিরগিটি' গল্পে মরা মাদার গাছ, 'পেঁপের ঝাড়, পেয়ারা এবং তাদের পাশে সতেঝ, লকলকে ডালিম গাছ। এ প্রকৃতি ইন্দ্রিয় সর্বস্ব। পাঁচ ইন্দ্রিয় সক্রিয় হয়ে প্রকৃতিতে আস্বাদন করা। প্রখর অনুভূতি প্রবণ, সংবেদনশীল একজন গাইডের হাত ধরে পাঠক প্রকৃতির রক্ত, রস, আঘ্রাণ, স্বাদ, বর্ণ নিজের রোমকূপেই চারিয়ে নিতে নিতে ঘুরে বেড়ায় সমুদ্র থেকে পদ্মায়, পদ্মা থেকে ভুবন সরকারের আস্তানায়, সারদা রায়ের বাগান থেকে বাগানে। কচকচিয়ে চিবিয়ে খান রসালো জাম, জামরুল। তাদের মিষ্টি কষা স্বাদ লেগে থাকে তাঁর জিভে। নিবিড় প্রকৃতির স্নিগ্ধ ছায়ায় য়ায়ায় জিরোনো নয় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী গল্পে জ্যান্ত প্রকৃতিকে গভীর অক্লেশে জড়িয়ে ধরেন পাঠক।

উত্তরণ দেখানোর জন্য না লিখলেও অন্তত কিছু গল্পে উত্তরণ ঘটেই যায়। এ উত্তরণ মানুষের চিরকালীন আকাঙ্ক্ষা। গণ্ডী ভেঙে বৃহৎ জীবনে মেশা, নদী যেমন সাগরে। বন্ধনমুক্তির আশঙ্ক্ষা। ছোটো আমি থেকে বড়ো আমির দিকে যাত্রা। 'নদী ও নারী' গল্পে হাত বাড়ানো, ঝুঁকে পড়া মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে বুক চিতিয়ে বাঁচার আকাঙ্ক্ষা। পটভূমি বিস্তৃত পদ্মা। যে একাধারে জীবনদায়ী ও রাক্ষসী। যে পদ্মা জীবনমৃত্যুতে অচ্ছেদ্য বন্ধনে রহস্যময়ী। সেই পদ্মায় দেখা হয় একজোড়া দম্পতির, জলের বুকে। অপরিচয়ের গণ্ডী ভেঙে গেলে নীলিমাকে মহীয়সী মনে হয় নির্মলাদের। রাইচরণের গর্বের বাবরি তার অস্তিত্বের সমার্থক। লোকের চোখে সেই বাবরি নকল হয়ে যাক এটা চায়না বলেই বেশি পয়সার থিয়েটারের চাররি অবলীলায় ছেড়ে রাই চরণ যেন বাঁচল। বাঁচল তার মাথা উঁচু করে চলা আত্মসম্মান। 'সমুদ্র' গল্পের কথকের কাছে ঝামাপুকুরের ফ্ল্যাটের বন্ধন অসহ্য। এটা সে উপলব্ধি করে সমুদ্রের কাছে এসে। এই অপার সৌন্দর্য, বিপুল তরঙ্গ, গর্জমান বাতাস তাকে বুঝিয়ে দেয় বৃহৎ কাকে বলে, ব্যাপ্তি কি। তার ইচ্ছে করে সমুদ্রবেলায় একটা ঝিনুক হয়ে শুয়ে শুয়ে কাটিয়ে দিতে, অনন্তকাল। ঝামাপুকুরের ফ্ল্যাটের মতোই তার কর্তৃ স্ত্রী হেনাও সমস্ত ক্ষুদ্রতা নিয়ে তার কাছে তুচ্ছাতিতুচ্ছ, অসহ্য একটা মতো। সে হেনাকে উৎসর্গ করতে চায় সমুদ্রের কাছে। 'গিরগিটি' গল্পে মায়া তুচ্ছ সংসারিকতা থেকে মুক্তি পায় প্রকৃতি আর নিজের শরীরের অনাবিল সৌন্দর্যের মগ্নতায়। বুড়ো ভুবন সরকারের নারী শরীরের সৌন্দর্য তৃষ্ণা আর আকাঙ্ক্ষা তাকে বার্ধক্যের গ্লানি-কাঠ-কংক্রীটের বন্ধজীবন থেকে মুক্তি পায় সারদার বাগানের নিবিড় প্রকৃতির মধ্যে। 'মঙ্গলগ্রহ' গল্পে কুলদা সাংসারিক ঘৃণ্যতা থেকে মুক্তি খোঁজে পরিচ্ছন্ন, সতেজ নারী সৌন্দর্যে। তারিণী চারপাশের নিষ্পেষণে পরাজয় না মেনে মাথা উঁচু করে, আত্মসম্মান নিয়ে বাঁচতে চেয়ে মরে যায়।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পের কোনো সংবাদ মূল্য নেই। আছে সৌন্দর্য সন্ধান। অতি সাধারণ কিছু মানুষ অবক্ষয়, তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতার বন্ধ দমচাপা জীবনে শেষ হয়ে যেতে যেতেও এক উদার, মহৎ, ব্যাপ্ত আকাশের দিকে হাত তুলে রাখে। প্রকৃতি বা নারীর আধারে সে আকাশের নাম সৌন্দর্য। বিশুদ্ধ সৌন্দর্য

কৃতজ্ঞতা:

১। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প। দে'জ পাবলিশিং ১৯৯৯

২। অনুষ্টুপ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বিশেষ সংখ্যা, প্রাক্ শারদীয় ২০০৯